দৈনিক সংবাদ
তারিখ 28 OCT 1988
পৃষ্ঠা ৮
183

বাংলা বানান, অনুভূতি ও কিছু কথা

সন্তোষ গুপ্ত

সম্প্রতি বাংলা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বাংলা বানানের সমস্যাবিষয়ক বিষয়ক তিন দিনব্যাপী কর্মশিবির হয়েছে কুমিল্লার নাউ-এ। বাংলাদেশ প্রাইমারি এডুকেশনাল বোর্ড (বাউ) আয়োজিত কর্মশিবির জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড (ঢাকা) এবং ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে করা হয়েছে। শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, সাহিত্যিকসহ উপর্যুক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। গত ২১শে থেকে ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই কর্মশিবিরে যোগদানকারীদের সংখ্যা ৪০ জনের মত হবে। এতে প্রাথমিক শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কয়েকজন অংশ নিয়েছেন।

আলোচ্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। বাংলা ভাষায় বানান সমস্যা নতুন নয়। তার সমাধানের প্রচেষ্টাও নতুন নয়। কর্মশিবিরে যারা অভিজ্ঞ প্রবক্তগণ পড়েছেন, তারা এসব উল্লেখ করেছেন। প্রবীণ পণ্ডিত কাজী দীন মুহম্মদ 'বাংলা যুক্তবর্ণ ও তার বিভাজন' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে যুক্তবর্ণ শিক্ষাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে--এ ধারণা থেকে যুক্তবর্ণ বিভাজনের প্রস্তাব রাখেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বাংলাবান উল্লেখ করেছেন এটা তাঁর মতানত, সিদ্ধান্ত নয়। টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর লুৎফুল হায়দার চৌধুরী তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেছেন যে, এই কর্মশিবির বানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে। বর্ণ সংস্কার কিংবা লিপি সংস্কার এ কর্মশিবিরের উদ্দেশ্য নয়।

বানান সমস্যার দুটো দিক রয়েছে। একটি হল কতকগুলি শব্দের একাধিক বানান। এই একাধিক বানানই ভুল। কিন্তু এটা শুধু শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিঘ্নই সৃষ্টি করে না, লেখক-সাহিত্যিকসহ বড়দের ক্ষেত্রে আনেক ব্যবহারের উচ্ছৃঙ্খলতা। অন্যদিকে বৃহৎ পরিসরের এ সমস্যা তাদেরও। দ্বিতীয় হল ক্রিয়াপদে একই শব্দের একাধিক বানান। এখানে সব ধ্বনি 'ই' ও 'ঈ' কার কিংবা উ ঊ-কারের সমস্যা নয়। এখানে কোথাও ও-কার যোগ হবে তা লেখকের মর্জির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন লেখক নিজস্ব বা প্রচলিত উচ্চারণবিধি অনুযায়ী সর্বত্র সমভাবে চলেন না। সুতরাং শিশুদের বানান সমস্যা বিভীষিকা হয়ে দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালের সুপারিশমালার পটভূমিতে আলোচনা অনেক সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে চালানো সম্ভব হয়েছে। মতবিনিময় ও আলোচনা শেষে একটা সর্বজনগ্রাহ্য (উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে) পথ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটাই হল বানান বিষয়ক কর্মশিবিরের সফলতা।

এখানে অংশগ্রহণকারী কেউ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেননি যে, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সমাধান হয়েছে। কারণ, আলোচনা ও বক্তৃতায় দেখা হয়েছে প্রধানতঃ বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে। বাংলা ভাষাভাষীদের ধ্বনি কিন্তু কোথায় ও কতটা বিভিন্ন এবং কি ভাবে তা আলোচনা দেখি না।

নিজেদের মধ্যে কোন বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। ১৯৩৬ সালে প্রবর্তিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের পর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও তা অনেকে উপেক্ষা করেছেন। এখনও অনেকে তাদের লেখার পুরানো বানান ব্যবহার করেন। বিশ্বভারতী আরও এগিয়ে গিয়েছিল ঐতিপূর্ব।

বাংলা ব্যাকরণ এখনও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত অনুযায়ী বলে, এবং তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে লেখকদের দ্বিধা ও সংশয় শব্দের বিভঙ্গতা তথা বানান অরাজকতার অন্যতম কারণ।

অতীতে এসব নুন বিষয় বাদ দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বানান সংস্কার, বর্ণ সংস্কার, লিপি সংস্কার নানাভাবে সামনে এসে পড়ার, আমাদের অবস্থা হয়েছে ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাওয়ার মত। তাই সাধারণ ব্যতিক্রম দেখা দিলে সংশয় উঁকি দেয়। এই সংশয়ের সবটাই যে মিথ্যা বা কল্পনাপ্রসূত এমন কথা বলার সময় আসেনি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের ১৯৮৪ সুপারিশমালায় ১০ম ধারায় কয়েকটি শব্দের প্রচলিত বানান পরিবর্তনের প্রশ্ন এসেছে। সেখানে যে কথাটা বলা হয়নি তাহল মূলতঃ আরবি বর্ণ অনুযায়ী বানান করার সুপারিশ। ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণ অনুযায়ী নয়। ফলে ফারসী শব্দ 'নমাজ' আরবি রীতি অনুযায়ী নামায করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় টেক্সট বুক বোর্ড ডঃ শেখ গুলাম মকসুদ হিলালীর পারসী এ্যারাবিক এলিমেনটস ইন বেঙ্গলী অভিধান অনুসরণ করেছে আরও কয়েকটি অভিধানসহ বানান রীতি স্থির করার জন্য। ওই অভিধানে, শব্দটি লেখা হয়েছে 'নমাজ' 'নামাজ' নয়।

একপর্যায়ে চলছিল। বা সংসদ অভিধানে কোথাও 'বাঙালি' বানান নেই, আছে বাঙালী বানান। যদিও বলা হয়েছে একাধিক বানানের মধ্যে প্রথম বানানটি অভিধান থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে। সকলে মীমাংসা করে নিলে বাঙালি বানান প্রচলনে বাধা দেখি না। কিন্তু এতে শব্দের অর্থগত কোন পার্থক্য হয় না এবং বাঙালী বানানে অভ্যস্ত চোখে নতুন বানানটি পীড়াদায়ক তো নয়ই, এবং আমার বাক্তিগত ধারণা লিপি এবং শব্দের অভ্যস্ত রূপ সে লাঙ্গলি ধারা বহন করে তাদের বড় একটা বাত্যয় ঘটে না।

আসল কথা হল নতুন কিছু গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহ ও আপত্তি দুই-ই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে নিজেদের উৎসাহ ও আপত্তি অপেক্ষা ভাষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি ব্যাকরণের আর্টেপৃষ্টে বেঁধে শব্দকে হাজির করতে হবে এমন কোন প্রয়োজন আছে দেখি না।

উদাহরণস্বরূপ, ইদানীং চলমান গণআন্দোলন শব্দটির বহুল ব্যবহার হচ্ছে। ব্যাকরণ মতে চলমান অশুদ্ধ। অবশ্যই সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী, কারণ সংস্কৃত ধাতুর আত্মনেপদী রূপের সাথে শানচ প্রত্যয়ের 'শান' হয়। পরস্মৈপদী ধাতুর ক্ষেত্রে হয় না। তাই রোরুদ্যমান শুদ্ধ রুদ্যমান শুদ্ধ নয়। চলমান, প্রবহমান নয়। এ যুক্তি শিরোধার্য করে বলতে চাই বাংলা শব্দ গঠনে মান প্রত্যয়কে যদি আমরা বাংলা প্রত্যয়ের অন্তর্গত করি তাতে বাংলাভাষা রসাতলে যাবে না। চলমান গণআন্দোলন শক্তিশালী না হোক, চলমান আমাদের ভাষায় শক্ত আসন করে নিতে বাধা দেখি না। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি 'কায়' ও 'ছায়' শব্দ অশুদ্ধ। কিন্তু আমরা লিখে যাচ্ছি 'কাঁয়া' ও 'ছায়া' তাতে যদি বাংলাভাষা রসাতলে না যেয়ে থাকে 'চলমান' শব্দ ব্যবহারে ঘ্রিয়মাণ হওয়ার কারণ দেখি না।

আর একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে। নিয়মানুযায়ী 'ট' বর্গে মূর্ধন্য-ণ যুক্ত হবে। কিন্তু লণ্ডন, ওণ্ডা ইত্যাদি শব্দে এ যাবৎ তাই লেখা হয়েছে। অথচ বিদেশী শব্দে দন্ত্য-ন ব্যবহার বিধেয়। যুক্তবর্ণের সংখ্যা এর ফলে বেড়ে যাবে এই বিবেচনায় মূর্ধন্য-ণ রাখা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিবর্ণীকরণে গৃহীত সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী লণ্ডন লেখা চলে। এ যাবৎ ব্যবহৃত ওণ্ডা, বানানাকেও ওণ্ডা লেখা চলে। কারণ নিঃসংশয়ে জানি বানানের এই চেহারা পরিবর্তনে ওণ্ডার চরিত্র পরিবর্তন হবে না কিংবা লণ্ডন বানান 'ন' দিয়ে লিখলে, সন লণ্ডত্ব হবার আশংকা নেই।

আসলে সমস্যাটা বাংলা ব্যাকরণের। পদে পদে সংস্কৃত ব্যাকরণের ছত্রছায়ায় চলতে গেলে গোল বাধবেই। বাংলা ব্যাকরণ এখনও সা প্রচলিত, তাতে এসব সমস্যার সমাধান হয়নি। বিভিন্ন লেখক, শিক্ষাবিদ এরা নিজেদের সুবিধামত এক একজনে একটা বেছে নিয়েছেন। এদের মধ্যে নতুন কিছু করতে ভাই বলে যারা 'হিশাব' বা 'হিশাব' লিখছেন তাদের কথা বলছি না। 'হিশাব' 'জিনিস' ইত্যাদি বানান বুদ্ধদেব বসু প্রচলন করেন। খুব চলেনি। একালেও নতুনত্বা নিজেদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য এরকম করছেন। 'শাল' শব্দটি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তার এক উপন্যাসে প্রথম ব্যবহার করেন চল্লিশ দশকের শুরুতে। ওই উপন্যাসে তিনি গাঢ় অন্ধকারের বর্ণনা দিয়েছেন 'শাল অন্ধকার' বলে। সেদিন শুরুর বয়সে অভিভূত হয়েছি। এখন উৎসাহবোধ করি না।

বাংলার ঈকারে 'ই'-কার না 'ঈ'-কার এনিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। ১৯৩৭ সালের ১৩ই জুন রবীন্দ্রনাথ কিশোরী মোহন গুপ্তকে এক চিঠিতে লেখেন ঃ

দৈনিক সংবাদ
তারিখ 28 OCT 1988
পৃষ্ঠা ৮

কুমেল্লে ... কেন্দ্র

লাগিয়ো। রানীতে ঈ। গয়লানী প্রভৃতি শব্দে আমি দীর্ঘ ঈ দিইনে তার কারণ এ প্রত্যয় সংস্কৃত প্রত্যয় নয়। এক হিসাবে প্রকৃত বাংলায় ঈলিঙ্গের প্রত্যয় নেই। আমরা শিলীনী বলি নে বেড়ালনীও বলি নে, কুকুরীও বলি না বাঘিনী বলি, উটনী বলিনে। বাঘিনী সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ নয়। বাঘনী বলি, কিন্তু বাঘিনী বলিনে, কারণেও বলি। বস্তুত বাঘিনী ছাড়া কোন জন্তু শব্দের ঈলিঙ্গ বাংলায় দুর্লভ। পাঁঠা আছে, ভেড়ী বলে কিনা জানিনে। হাঁস, কাক, পায়রা, (মুরগী আছে) কোকিল দোয়েলে ঈলিঙ্গ প্রত্যয় বর্জিত। বাংলায় যদি সাধারণ কোনো প্রত্যয় থাকত তাহলে সর্বত্র বাঞ্ছিত। এই জন্যে আমি বাংলা জীজাতিসূচক কথাগুলিকে খাঁম বাংলা নিয়মেই ব্যবহার করতে চাই--খাম বাংলা। হচ্ছে হস্বই। সংস্কৃত ঈন্ প্রত্যয়ের সেখানে সকল করি সেখানেও আমার মন সায় দেয় না। যেমন ইংরেজি, জার্মানি ইত্যাদি। তৎসম শব্দে দীর্ঘ ঈ দিতে আমরা বাধ্য কিন্তু তদ্ভব শব্দে আমাদের স্বাভাব খাটবে না কেন?" কিশোরী মোহন সাঁন্তরা একসময় বিশ্ব-ভারতীতে মুদ্রণ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন।

ঈলিঙ্গে দীর্ঘ ঈ-কার ব্যবহার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন ঃ "সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার ঈলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈ-কার বা ন'এ দীর্ঘ ঈ-কার মানবার যোগ্য নয়। বাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করেনি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারল না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করা যায়। তার ব্যতিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই পক্ষে তিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে সেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হয় ই-কারকে মানব। উচ্চারণের 'মুসলমানি' শব্দে যে ই-প্রত্যয় সেটা যে 'সংস্কৃতীনী' তা জানিবার জন্যই অসংকোচে ঈ-কার ব্যবহার করা উচিত"। (বাংলা ভাষা পরিচয়)

দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানান পদ্ধতি থেকে সরে এসেছেন। বিশ্ব-ভারতীর বানান পদ্ধতি পৃথক হওয়ার দরুন সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান পদ্ধতি এখন আর চলছে না। আমাদের এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তাই কর্মশিবিরে বানান পদ্ধতি আলোচনাতে বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে দেখা গেল বাংলা ভাষার নিজস্ব নিয়মটি সেখানে ধরার একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যদিও ডঃ আলিনুজ্জামানের প্রবন্ধটি সেখানে বানান পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটা নীরাংসায় আসার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে অগ্রসর হয়েছি।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে উচ্চারণ শুদ্ধতার দোহাই এবং ধ্বনিতত্ত্বের শাসন মানব না। এমন কথা বলতে চাই না। মূল কথাটা হল বানান রীতির একটা পদ্ধতি স্বীকার করে নিতে গেলে আমাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু তৎসম শব্দের তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিজের শুদ্ধতর প্রকৃত বাংলা ও বিদেশী শব্দের তা মানবার হেতু দেখি না। আবার সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেও বাংলার নিজস্ব বিধান অনুসরণ করা যায় ব্যাপক ব্যবহার ও শব্দের অর্থ যদি স্পষ্ট থাকে অর্থাৎ বক্তার মনের ভাব যদি পরিপূর্ণ প্রকাশ পায়। 'প্রবহমান' শব্দের বানান ও গঠন প্রকৃতির ত্রুটি 'বাংলা বানান' গ্রন্থে নীলিক কুমার ঘোষ দেখিয়েছেন। কিন্তু এ সত্ত্বে একথা যেন স্বীকার করি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় 'তুমি প্রবহমান প্রদাহ নও' অর্থ অনুপ্রাসের জন্যই সুন্দর নয়, স্বাভাবিকভাবেই অর্থ গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না, যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'চলমান গণআন্দোলন' শব্দ আমাদের রাজনৈতিক দল, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ব্যবহার করে আসছেন, তাতে তাদের বক্তব্য ও গণআন্দোলনের চলিষ্ণু স্বরূপটি বুঝতে অসুবিধা হয় না, চলমান গণআন্দোলনের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন।

লক্ষ্য রাখতে হবে, না-জেনে এবং মাতৃভাষা বলে বাংলা অভিধান দেখা অপ্রয়োজনীয় ধরে নিয়ে ভুল বানান যেন না লিখি। যত্ন-সহকারে ইংরেজি বানান শিখব কিন্তু বাংলা লেখার সময় যেহেতু মাতৃভাষা সুতরাং এখানে নৈরাজ্য চলবে, এমনটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। শিশুকে যদি যত্নপূর্বক শিখানোর দায়িত্ব স্বীকার করি, তবে নিজের ভাষার পরিধি বাড়ানোর জন্যও যত্ন নিতে হবে। তেমনি শব্দের ব্যাপারেও স্পর্শকাতরতা থাকা ঠিক নয়। দুর্ভাগ্য যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একদা শুধু মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রতি ভ্রূকুঞ্চন করেনি, ভাষার জন্তিবর্ণ নিয়েও বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিল। যে সময়টা এখনও দূর হয়েছে বলা যায় না। বহু বিদেশী শব্দ আমাদের ভাষায় এসেছে, তার উচ্চারণভঙ্গী আমরা আয়ত্ত করেছি, ইংরেজি ভাষার উচ্চারণবিধির অনুকূলে। এবং আমরা লিখতাম এবং এখনও অনেকে ক্রিকেট ফিল্ডেল ক্যাপ্টেন, স্টালিন ইত্যাদি। কেউ 'মহাদেশীয় রীতি অনুযায়ী (বা সঠিক) লিখেন ফিল্ডেল কাস্ট্রো, স্তালিন ইত্যাদি। কিন্তু দুয়ের মিশ্রণ বৈধ নয়। যেমন ফিডেল কাস্ত্রো বা স্তোভিয়েট এবং স্তালিন কিংবা স্তোভিয়েত ও স্টালিন। দুয়ের একটা অনুসরণ করতে হবে। বাংলায় বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রেও তাই আরবি শব্দের উচ্চারণ (যতটা সম্ভব) ও বানান যদি লিখি তবে ওমু, হযরত, রমবান লেখা বিধেয়। ওয়ুলিয় ফারসী বানান ওজু, হজরত, রমজান। স্মরণে রাখা দরকার, আরবী 'জ' এবং 'য' উচ্চারণে তফাৎ করিনা। বা করতে পারি না।

ফারসী শব্দের বানান ও উচ্চারণ বিধি ভিন্ন। ফারসী বানান যদি লিখি তবে ওজু, হজরত, রমজান লেখা বিধেয়। ওয়ুলিয় ফারসী বানান ওজু, হজরত, রমজান। স্মরণে রাখা দরকার, আরবী 'জ' এবং 'য' উচ্চারণে তফাৎ করিনা। বা করতে পারি না।

[illegible] (শব্দটি) নামাজ [illegible] ফারসি [illegible] বানান [illegible] কিনা, এনিয়ে আমার সংশয় রয়েছে। অনুভূতির প্রশ্ন উঠতে পারে এবং উঠেছেও। তাহলে কি করে নেব যে, মাদের ভাষায় অর্থাৎ ইরানের প্রচলিত ফারসি ভাষায় ব্যবহৃত এসব শব্দের সঙ্গে তাদের অনুভূতি জড়িত নয়। বিষয়টি হল কোন ভাষাকে আমরা এক্ষেত্রে গ্রহণ করব। এতদিন ফারসি বানান পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। এখন আরবি করতে চাইলে আপত্তি দেখিনা। অভ্যস্ত চোখে প্রথম প্রথম চমকে উঠবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অনুভূতির যুক্তি তো এক্ষেত্রে ধোপে টেঁকে না।

আসল কথাটা হল আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মাতৃভাষার শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেন তাদের উপর ব্যাসাদের উদ্ভাবনের চাপিয়ে না দিই এবং ভাষার কাঠিন্য আরোপ না করি তৎসম শব্দের উপদ্রব চাপিয়ে। তাদের জন্য লিখিত কবিরে 'বর্ষজলধরপটলে গগন আবৃত' না করে, যদি 'কালো' মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়' তাহলে শিক্ষা গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হবে না, বরং সহজ হবে। কর্মশিবিরের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই এ ব্যাপারটি লক্ষ্য রেখেই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ছোটখাট মতভেদ আলোচনার মাধ্যমে নিরসন হয়েছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে কর্মশিবিরে অর্জিত সাফল্যকে সংহত করার জন্য প্রয়োজন একটি বাংলা অভিধান ও বাংলা ব্যাকরণ। বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদদের এদিকে আশু নজর দিতে হবে। আর গুরুত্ব দেয়া সম্পর্কে একথাটা বলা যথেষ্ট বে, জীবন্ত ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নির্দেশনা কঠোরভাবে মানতে গেলে ভাষার চলৎশক্তি ব্যাহত হবে। ফিলিপ হাওয়ার্ড ইংরাজী ভাষা ও ব্যাকরণ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ জীবন্ত ভাষা হল গণতন্ত্র। আলফ্রেড অস্টেনের মত আমাদের ব্যাকরণের ভুল সম্পর্কে এ অজুহাত আমরা দাঁড় করাতে পারি যে, এগুলো উঁচু মহল থেকে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় অথবা আমাদের নিজেরা সঠিক মনে হয়। অন্যে আমাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এবং বলতে পারেন আমাদের ইংরেজি উচ্চারণ-ভুল হয়েছে। যেন আমরা মনে রাখি। গণতন্ত্র বলতে এই মত প্রকাশকেই বুঝিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রভাবশালী ব্যবহারকারীর দিকেই ব্যাকরণ ঝুঁকে পড়ে। বাংলা ভাষার ব্যবহার ও বানান পদ্ধতি এবং নতুন শব্দের ব্যবহার রূপ কী হবে তা স্থির করার ক্ষেত্রে পুরাতনের দোহাই পাড়া সর্বত্র সব কিছুতে যুক্তিযুক্ত নয়। একথাটা স্বীকার করে অগ্রসর হওয়া যায়। কর্মশিবিরের উদ্যোক্তা এবং অংশগ্রহণকারিগণ একথাটা কম বেশি মনে রেখেছেন। এজন্য তিনদিনে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যকীয় আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে এবং সঠিক দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।